ক্যারন্ত এ আঁ

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

‘ক্যারন্ত এ আঁ! ক্যারন্ত এ আঁ!’ অর্থাৎ ‘একচল্লিশ!’ একচল্লিশ আমার ঘরের নম্বর। একতলার রিসেপশানে আমার ফোন এলে এভাবে করিডর মাইকে ঘরের নম্বর ঘোষণা করে হাঁক পাড়েন আমাদের ছাত্রাবাসের কেয়ারটেকার মাদাম কার্মস। ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে অনেক সময় এই ডাক শোনাও যায় স্পষ্ট, কিংবা শুনেও মনে হয় ও ডাক আমার জন্য নয়। তখন আশপাশের কোনো ঘরের ছেলে বা মেয়ে এসে দরজায় টোকা দিয়ে ডাকে, ‘রাজীব!’ অন্য সবার বেলাতেও এই রীতি। বিশেষত আমার পাশের ঘরের গ্রিক মেয়ে মারিয়া পাপালুসের ক্ষেত্রে। যতক্ষণ ঘরে আছে হয় মন দিয়ে অঙ্ক কষছে নয়তো বিয়ার খেয়ে ঘুমাচ্ছে। মাদাম কামসের ডাক কখনো তার কানে পৌঁছোয় না।

আজ কিন্তু এই নিয়ে তিনবার ডাক এল আমার। এবার লিফটে নামতে নামতে আমার কেবলই মনে হচ্ছে এ ডাকটাও ভুল। ক্যারন্ত এ আঁ’ নম্বর চাইছে হয়তো কিন্তু সে আমাকে চাইছে না। আগের দু-বারই টেলিফোনের

মহিলা কন্ঠটিকে ‘রং নাম্বার’ বলে চলে এসেছি। কিন্তু তারপরেও এই ডাক। সত্যিই ও কাকে চায়?

ফের রিসিভার তুলে বললাম, হ্যালো! আর অমনি ও প্রান্ত থেকে সেই সুরেলা ফরাসিনী কন্ঠ, ক্যারন্ত এ আঁ?’ ফের কিছুটা বিরক্তি দমন করে বললাম, হ্যাঁ। তবে আমার মনে হয় ওই ঘরের আগের বাসিন্দাকেই আপনি চাইছেন। কী নামের লোককে আপনি চাইছেন বলুন তো?

মেয়েটি এবার বেশ দুষ্টুমির স্বরেই বলল, ক্যারন্ত এ আঁ! হঠাৎ ভীষণ রাগ চড়ে গেল মাথায়, ভাবলাম দড়াম করে ফোনটা নামিয়ে দিই! মানুষের কাজের সময় ঘন ঘন ফোন করে নওছল্লা! পরমুহূর্তে ভাবলাম, আহা, থাক। ও কী চায় দেখি। এবার ‘আপনি’ সম্বোধনকে ‘তুমি’তে নামিয়ে এনে বললাম, একচল্লিশ বলছি, বলো কী করতে হবে?

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে এক দমকা হাসি ওপারে। সহসা লজ্জা হল, মেয়েটা বুঝিবা আমাকে নিয়ে মশকরা ফাঁদছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ফোনটা আর নামাতে পারলাম না। বললাম, কী হে মাদমোয়াজেল, এত হাসি কীসের? ওপার থেকে আওয়াজ এল, ভয় কেটেছে তাহলে, মসিয়ূর? এবার আর আমি কোনো জবাব দিলাম না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে বেশ ঠ্যাটা মেয়ে। হয়তো রসিকও।

একটু থেমে ও-ই বলল, বিকেলে কী করছ মসিয়ূর? বললাম, কিছু না। কাফেতে বসে সময় কাটাব।

—আমার পছন্দসই একটা কাফেতে আসবে?

–সেটা কোথায়?

—শালে লে-আলের কাছে। খুব খোলামেলা জায়গা। তোমার ভালো লাগবে।

–সেটার নাম কী?

–কাফে দ্রুজো।

–বুঝলাম। ও কাফে আমি চিনি। বাজে মেয়ের ভিড় হয় বড্ড।–

-তা হোক না। আমিও তো বাজে মেয়ে। মন্দ লাগবে না। এবার দু-জনেই আমরা টেলিফোনের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, বাপরে! এ মেয়ের সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল। তারপরেই মনে ফের প্রশ্ন উঠল, ওকে চিনব কী করে? তাই জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু অতশত মেয়ের মধ্যে তোমায় চিনব কী করে?

—সে দায়িত্ব তোমার। যাকে তোমার আমি বলে মনে হবে তার পাশেই গিয়ে বোসো।

-বসে কী নাম ধরে ডাকব?

মেয়েটি হঠাৎ করে নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও করল না। বলল, দেখি কী নামে তুমি ডাকো আমাকে। আর প্রায় তৎক্ষণাৎ ফোনটা নামিয়ে রাখল ওদিকে। আমি হতবুদ্ধির মতন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ফোন হাতে। যে মেয়ের নাম জানি না, জীবনে কখনো দেখিনি, কী বয়স সে আন্দাজও নেই, তাকে একরাশ মেয়ের মধ্যে থেকে বারই বা করব কী করে? গলার স্বর যদিও বা শুনেছি তাও টেলিফোনে। আর যাকে-তাকে যা-তা নামে সম্বোধন করে কি মার খাব নাকি শেষে? ভাবলাম, দূর ছাই! যাবই না। আমার কী এত তাড়া? আলাপ করার এত রস থাকলে ও নিজেই ফোন করবে।

‘যাব না, যাব না’ এটা শুধু ভাবনাতেই থেকে গেল, যত দুপুর গড়াতে থাকল হৃদয়ের একটি তাড়না শুরু হল একটিবারের মতন মেয়েটিকে চাক্ষুষ করার। ক্রমে না যাওয়ার চিন্তা উবে গিয়ে প্রবল কৌতূহল আর আবেগ দাপাতে লাগল বুকের ভেতরটায়। একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম বটে, কিন্তু সমস্ত মন ছেয়ে রইল ওই না-দেখা মেয়েটার কথা ও কন্ঠধ্বনি। আমি মাঝে মধ্যে ঘড়ি দেখতেও আরম্ভ করলাম।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমি সিতে উনিভার্সিত্যার মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলাম শালে লে-আলের। আমার কামরায় ক’টি যুবতী ছিল, তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছিলাম এদের মধ্যে সেই মেয়ে যদি থাকে। কাজটা যে কত অবান্তর, কিছুক্ষণ পর সেই জ্ঞান হতে বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম নিজেই। এভাবে আদেখলের মতন মেয়েদের দিকে তাকালে মেয়েরাও মজা পায়। একটি মেয়ে তো ফিক করে হেসেই দিল, আর দিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল জানলার দিকে। আমি বুঝলাম এটা আমার হাভাতেপনার জবাব।

লে-আলে এসে ভূমধ্যস্থ কনভেয়ার স্ট্রিপে চেপে শালের দিকে চলে গেলাম। পরে এস্ক্যালেটরে চড়ে যখন রাস্তায় উঠে এলাম, তখন ঘড়িতে বাজে ছ-টা আর আকাশের আলো মিলিয়ে যায়-যায়। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলাম কাফে জোর দিকে।

এর আগে কাফে জোতে যে কখনো বসিনি তা নয়। লে-আলে বাজারের এক বিশেষ প্রান্তে পাথুরে রাস্তার এক কোণে সারাদিন ভিড়ে জমজমাট এই কাফেতে কয়েকবার টু মেরেছিলাম বাংলাদেশি বন্ধু রশিদের সঙ্গে। এখানে কোন মেয়ে যে বারবনিতা আর কোন মেয়ে যে তা নয়, সেটা খুব অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া ঠাউরে ওঠা দায়। রশিদ তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে, এসব মেয়ের কেউ কেউ দেহপসারিণী। সমানে বলছিল, আমারে কইলে তো আমি

যেডারে খুশি বিয়া করতে পারি। তখন ওকে প্রায় নিরস্ত করার জন্যই বললাম, তা মিঞা, তোমায় বিয়ে করছেটা কে? তখন কিছুটা আহত বোধ করে রশিদ বলল, তা ব্যাশ্যারে বিয়া নাই বা করলাম। ক্ষতি কী?

দ্রুজোতে আজও বেশ ভিড়। সামনে রাস্তায় একজন যাদুকর শীতের মধ্যেও খালি গায়ে আগুন গেলার খেলা দেখাচ্ছে। অন্ধকার আকাশের পটে সেই লেলিহান শিখা একটা চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জিপসি গোছের একটি দম্পতি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে স্প্যানিশ গান গাইছে। টেবিলে টেবিলে বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষের জটলা, পানাহার। আমি দেখেশুনে একটা দূর প্রান্তের খালি টেবিল বেছে নিয়ে ওয়েটারকে অর্ডার করলাম, দু ভ্যাঁ ব্ল। অর্থাৎ সাদা ওয়াইন। এই সাদা ওয়াইন জিনিসটা আমার খুবই প্রিয়, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে একলা একলা সময় কাটাতে পারি কিছু সাদা ওয়াইন আর কড়া তামাকের সিগারেট নিয়ে। আমি ওয়াইন আসতে পকেট থেকে মার্লবরোর প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ধরালাম।

দু-চুমুক ওয়াইন পেটে পড়তেই নিজেকে খুব সুখী-সুখী লাগছিল। ভুলেই যাচ্ছিলাম আমি কেন এখানে এসেছি। হঠাৎ পাশের টেবিল থেকে একটা খিলখিলে হাসি। আমি চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, গোলাপি গাউন-পরা এক সদ্য যুবতী তার পাশের ছেলেটির সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে ঢলে ঢলে কথা কইছে। একবার ভাবলাম গলাটা সেই ফোনের গলা নয়তো? তারপরেই ভাবলাম, ধুস। সে মেয়ে পুরুষের সঙ্গে বসে থাকবে কেন?

আমি আবার ঝিম মেরে বসলাম। এবার হঠাৎ চোখ পড়ল একটি নিঃসঙ্গ মেয়ের দিকে। কালো সোয়েটার পরে একমনে সিগারেট টানছে আর আগুনের খেলা দেখছে। আমার ঘোর সন্দেহ হল এই মেয়েই হয়তো সেই মেয়ে। আমি উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম, যেমন খদ্দেরের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়ায় ভালো

ওয়েটার। মেয়েটা কিন্তু একমনে জাদুকরের কান্ড দেখে যাচ্ছে। জাদুকর ভুক ভুক করে আগুন খাচ্ছে আর হাঁ করে সেই আগুন ছুড়ে দিচ্ছে শূন্যে। আমি শুধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি মেয়েটিকে কী নামে সম্বোধন করি। মেয়েটিও দেখি কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে না আমার দিকে। আমি শেষে একটা দুটো ঢোক গিলে বললাম, ক্যারন্ত এ আঁ।

মেয়েটি এবার মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল বটে কিন্তু সেই চাহনির কোনোই মানে নেই। স্পষ্ট বুঝলাম আমার ছুড়ে দেওয়া কথাটার কোনো মানেই দাঁড়ায়নি তার কাছে। তখন তাড়াতাড়ি বললাম, পারদোঁ মাদমোয়াজেল, জে এম্পে। অর্থাৎ, সরি ম্যাডাম, ভুল করে ফেলেছি।

ফের এসে নিজের জায়গায় বসলাম আর একটু বিষণ্ণও বোধ করলাম। কোন এক পাগলির টেলিফোন শুনে কী ঝঞ্ঝাটেই না পড়েছি। ফের চুমুক দিলাম ওয়াইনে আর নতুন একটা সিগারেট ধরানোর উপক্রম করলাম। হঠাৎ আমার কানের পাশেই সেই আধাপরিচিত খিল খিল হাসি আর নীচু স্বরে ডাক, ক্যারন্ত এ আঁ?

আমি ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলাম কালো সোয়েটার আর সাদা স্কার্ট-পরা সেই মেয়েটাকেই, যে একটু আগে আমার ডাক শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমি ভয়ানক অবাক বোধ করে প্রায় তোলাতে তোলাতে বললাম, তুতু–তুমি? মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ, আমি বুন্কুরাম।

-তা তখন ওরকম হাবাগোবার ভাব করলে কেন?

–দেখছিলাম তোমার মনের কতটা জোর। ভড়কে যাও কি না।

—তা ভড়কে তো একটু গেছিলামই। যাক গে, তুমিও তো আমায় চিনতে পারোনি।

—কে বললে চিনতে পারিনি? চিনতে পেরেছি বলেই তো না-চেনার ভাব করছিলাম।

এবার আমি সত্যি সত্যি দমে গিয়ে বললাম, ও! মেয়েটি তখন ওর ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হাতটা ধরে অন্তত বসতে তো বলো। কতক্ষণ আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?

খুব লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসলাম। আর জিজ্ঞেস করলাম, কী পানীয় নেবে মাই ডিয়ার? মেয়েটি আমার সাদা ওয়াইনের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বলল ওইটা। আমি ওয়েটারকে ডেকে আরও একটা সাদা ওয়াইনের অর্ডার দিলাম। তারপর টেবিলের ওপর আলতো করে রাখা ওর হাতটার উপর আমার হাতটা পেতে বললাম, এবার তোমার নাম জানতে পারি কি, প্রিয়তমা?

সঙ্গে সঙ্গে ফের সেই বিদ্রুপাত্মক খিলখিলে হাসি। এবার লজ্জা নয়, রাগই হল আমার। আমি ওর হাতটা সজোরে চেপে ধরে বললাম, তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? এভাবে দু জনে দু-জনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকে গেলে কি কোনো বন্ধুত্ব হতে পারে? আর কেনই বা প্রয়োজন তেমন বন্ধুত্বর।

মেয়েটি আমার হাতের তলা থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমার মুখের ওপর চাপা দিয়ে বলল, শ-শ-শ। চুপ! এত রাগ করার কী আছে। নাম বলার কি সময় পার হয়ে গেছে? বরং তোমার নামটাই বলো আমাকে।

আমি রাগে গজরাতে গজরাতে বললাম, আমার নাম ‘ক্যারান্ত এ আ’। আর অমনি উচ্চতরালে হাসতে লাগল মেয়েটি। রাগ আমারও একটু একটু চড়ছিল আর হঠাৎ তা এমনই বিশ্রী পর্যায়ে উঠে গেল যে ওয়েটার যখন ওয়াইন নিয়ে টেবিলে এল, আমি একটা দশ ফ্রাঁ-র নোট তার প্লেটে ছুড়ে দিয়ে খুব রূঢ় একটা মের্সি’ অর্থাৎ ধন্যবাদ মেয়েটিকে উপহার দিয়ে প্রচন্ড জোরে পা চালিয়ে কাফের থেকে বেরিয়ে গেলাম। তারপর সেই অদ্ভুত গতিতে হাঁটতে থাকলাম নদীর দিকে। মাথাটা আমার অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে, নদীর পাশে না গেলে তা আর ঠাণ্ডা হওয়ার উপায় নেই। নাম-না-জানা এই উটকো মেয়েটিকে আমার এখন একটি বেশ্যা বলেই মনে হচ্ছে।

আমি জোরে হাঁটলে সেটা সত্যিই খুব জোরে হাঁটা হয়। বড় অল্প সময়েই তখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই। এক্ষেত্রেও হাঁটার স্পিড এত অস্বাভাবিক বেশি হয়ে গিয়েছিল যে নিজে ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই দেখি স্যেন নদীর উপর প ন্যফ বা নতুন ব্রিজের গোড়ায় চলে এসেছি। আমার সম্বিৎ ফিরে এল নদীর ওপারে আলোর মালা, নদীর কালো জলে প্রতিফলিত আলোর সারি, একটুকরো চাঁদ আর নদীর দূর কোণ থেকে ভেসে আসা স্টিমারের যান্ত্রিক ধ্বনিতে। নদীর পাশে বা নদীর ওপর সেতুতে দাঁড়িয়ে আমি কখনো রাগী থাকতে পারি না। নদীর জল আমার রাগ গলিয়ে জল করে দেয়। হঠাৎ নিজের শরীরটা বেশ হালকা বোধ হল, আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সেতুর রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। আর ঠিক তক্ষুনি আমার কানের পাশে বেজে উঠল ফের সেই ধ্বনি, তুমি রাগ করেছ সোনা?

আমি মাথা না ঘুরিয়েও টের পাচ্ছিলাম এ গলা কার। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না রাগব না কাঁদব। নাকি সপাটে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেব মেয়েটির গালে। কিন্তু না, আমি কিছুই করলাম না, কারণ আমার শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে আসছে। এত দ্রুত যে মেয়ে আমার পিছু নিতে পারে এই সন্ধের

অন্ধকারে, তার মাথায় কিছু জটিল মতলব আছে। সে সহসা নিস্তার দেবে না আমাকে। আমি রেলিং ছেড়ে শরীরটাকে সোজা করবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু তার আগেই মেয়েটি আমার মুখটা ওর বুকের মধ্যে ঠেসে ধরে আমার মাথায় চুমুর আদর দিতে লেগেছে। ওর হাতের ও মুখের স্পর্শ ওর কালো সোয়েটারের চেয়েও উষ্ণ। তার চেয়েও উষ্ণ আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়া ওর নিঃশ্বাস। আমার মনে হল, ওই ভালোবাসায়-ভরাডুবি বুকে মাথা রেখে আমার মৃত্যু হলেই ভালো হয়। এই আলিঙ্গন থেকে কোনোদিন যেন আমার মুক্তি না হয়। আনন্দে, সোহাগে সম্পৃক্ত আমি এই অযাচিত, অকল্পনীয় ভালোবাসায় ভেতরে ভেতরে এতটাই দ্রব হয়ে উঠলাম যে, আমার চোখ বেয়ে দু ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেবলই বলতে থাকলাম, আমি আর তোমার নাম জানতে চাই না, প্রিয়তমা। কোনোদিনও জানতে চাইব না। তুমি শুধু আমায় ছেড়ে যেয়ো না কোনদিন।

এবার মেয়েটি আমার মুখটা তুলে ধরল ওর মুখের দিকে আর গভীরভাবে তাকাল আমার চোখের দিকে। আমার চোখের জল গিয়ে লেগেছিল আমার চশমায়, কিন্তু সেই ভিজে কাচের মধ্যে দিয়েও আমি দেখতে পেলাম, মেয়েটি কাঁদছে। দু-টি অশ্রুর ফোঁটা টলটল করছে ওর চোখের কোণে আর এক অব্যক্ত বেদনায় কুঁকড়ে উঠছে ওর পরম সুন্দর মুখটি। আমার নামও জানে না ও, তাই অস্ফুট স্বরে শুধু আমায় ডাকছে, 'ক্যারন্ত এ আঁ! জ্য তেম। ক্যারন্ত এ আঁ! জ্য তেম।' 'একচল্লিশ! আমি তোমায় ভালবাসি।' আমার কিন্তু মুখ দিয়ে আর কোনো কথা সরছে না, যা বলতে চাই সবই যেন নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে, সবই কীরকম বরফ হয়ে গলার মধ্যে থকথক করছে। আমি ফের মুখ ঘসতে লাগলাম ওর মুখে, আমার ডান হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম ওর স্তন, তারপর ক্লান্ত শিশুর মতো ঢলে পড়লাম ওর কোলে।

একটু বাদে যেন গলার জমা বরফ আরও জমে উঠে পাথর হতে লাগল। বাকরুদ্ধ নই শুধু, আমি ক্রমশ যেন শ্বাসরুদ্ধও হচ্ছি। আমি মাথা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে উঠতে গিয়ে অনুভব করলাম দুটো শক্ত হাত আমার গলায় বসে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি আতঙ্কে চোখ মেলে দেখতে পেলাম সে হাত কার, কিন্তু চোখের সামনে সেই সুন্দর বেদনাকম্পিত মুখটাই দেখলাম। শুধু একটা সামান্য হাসির ঝিলিক যেন ওই দুঃখী মুখে। আমি হাত দিয়ে গলার হাত দুটিকে জোর করে ছাড়াতে চেষ্টা করতেই সুন্দরীর হাসি আরও পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল ঠোঁটে। চোখের জলটাও যেন কখন উবে গিয়ে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে একটা কঠিন, নির্মম আক্রোশ। আমি আরও জোরে চাপ দিলাম গলার হাত দুটোয়, কারণ আমার সমস্ত দমই প্রায় শেষ হতে চলেছে। আমার হাতের চাপে মেয়েটির হাত সরে গেল ঠিকই, কিন্তু সেই মুখে ওর চোখের কোটর থেকে মণি দুটোও কীভাবেই জানি অন্তর্হিত হল। একটি অনুপম সুন্দর মুখে কোনো চোখ নেই! —এই সুরিয়ালিস্ট দৃশ্য যে জীবনে কখনো দেখতে পাব এ আমার সমস্ত কল্পনার অতীত! আমি আমার ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মনটাকে নিঙড়ে কোনো মতে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, কে? কে তুমি? বলো তুমি কে? এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার অবসন্ন হাত দুটোও এগিয়ে গেল রূপসীর গলার দিকে। আমি সজোরে চেপে ধরলাম ওর সরু, নরম সুন্দর গ্রীবা। আমার আকাঙ্ক্ষা হল ওর গলা সেভাবেই কিছুক্ষণ টিপে ধরি যেভাবে এতক্ষণ ও টিপে রেখে ছিল আমার কণ্ঠ। কিন্তু ওই পর্যন্ত! ওর গলা স্পর্শ করামাত্রই ওর সুন্দর দাঁতের পাটি হাসিতে জ্বলে উঠল। তারপর সেই হাসি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল গোটা মুখে, যেন কঙ্কালের হাস্য। সেই খিলখিলে আওয়াজটা ফিরে এল কণ্ঠে, এবং আমি যত চাপ দিতে থাকলাম ততই উচ্চতরালে হতে থাকল ওই হাসি। কতক্ষণ এভাবে চেপে ধরেছিলাম ওর গলা আমার স্মরণ নেই। শুধু এটুকুই অনুভব করেছিলাম যে মেয়েটি ক্রমশ রেলিং ভেদ করে পিছিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে এবং সেই সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। রেলিং থাকতেও ওর শরীর ওপারে নদীর মধ্যে ঢলে গেল এক সময়, রেলিঙে বাঁধা পড়ল আমার শরীর।

আমার দুটো হাটু মাথা রেলিঙের ওপর, আরেকটু এগোলেই গোটা শরীরটা তলিয়ে যেতে পারত। কিন্তু গেল না।

আমি হোস্টেলে ফিরে এসে লিফটের দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মাদাম কার্মস আমায় জিজ্ঞেস করলেন, খুব রূঢ় কণ্ঠে, আবার নিশ্চয়ই খুব নেশা করে ফিরছ, রাজীব? এভাবে কি পড়াশুনো হবে তোমার?

মাদাম কার্মস আমার অভিভাবিকা নন যে এমন সুরে কথা কইতে পারেন। কিন্তু তাহলেও আমি কোনো প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে কি খুব রুখুসুখু লাগছে? মাদাম ফের ঝাঁঝের মাথায় বললেন, সেটা বললে কমই বলা হয়। তোমার দেখে মনে হচ্ছে বার্বেসের কোনো বেশ্যার বিছানা থেকে উঠে আসছ।

মাদামের এই কথাটা শেলের মতন বিধল বুকে। আমি লিফটে না উঠে একতলার টয়লেটে ঢুকে পড়লাম আর বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। আমারসারা মুখে ও জামার কলারে লিপস্টিকের ছোপ। গলায় দু-তিনটে কালশিরের দাগ। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। ঠোঁটের এক পাশে খানিকটা ছড়ে গিয়েছে। চুল উশকোখুশকো আর বুকের কাছে দুটো বোম ছেড়া। কীভাবে, কী কাজে এমনটা হয় সে প্রশ্ন তোলারও অবকাশ নেই। নিজেকে দেখে নিজেরই করুণা হচ্ছে।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা আর মাদাম কাসের হাঁক, রাজীব! রাজীব! টেলিফোন!

আমার রক্ত ফের জমে বরফ হচ্ছে। আমি জানি এ ফোন কার। আমি জানি এবার ও আমায় কোথায় যেতে বলবে। এবার গেলে যে আমি ফের আসতে পারব তারও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তাও যেন যাওয়ার জন্য বাসনা জাগছে

ভেতরে। শরীর ফের উষ্ণ হচ্ছে, মাথায় একটা ঘোর সৃষ্টি হচ্ছে। আমি চোখে মুখে সামান্য জল ছিটোতে ছিটোতে চেঁচিয়ে বললাম, যাচ্ছি, মাদাম কামঁস!

যখন দরজা ঠেলে বেরুলাম, দেখি দরজার পাশেই মাদাম গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমি এগোতে যাব, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, রাজীব, ফোনের ওই মেয়েটির গলা আমি চিনি। মনে হয় বেশ্যা। ওর পাল্লায় পড়ে তোমার ঘরেরই আগের বাসিন্দা পিটার মাথা খারাপ হয়ে হাসপাতালে। ও-ও একদিন ফিরে এসেছিল এই তোমার মতন চেহারা করে। তখন বুঝিনি ও কোন পথে গেছে। তারপর একদিন নতুন ব্রিজের মাঝখানে ওকে আধমরা অবস্থায় পাওয়া গেল। সেই থেকে হাসপাতালে।

মাদামের কথাগুলো ভীষণ খাঁটি বলে মনে হল, কিন্তু আমার ভেতর থেকে প্রবল প্রতিরোধ ওই উপদেশ মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে। আমি আস্তে আস্তে কাউন্টারে এসে ফোনটা তুলে নিলাম আর খুব আদরের স্বরে বললাম, হ্যালো!

আর ওপারে সেই প্রিয়, পরিচিত খিলখিল হাসি আর প্রশ্ন, ক্যারান্ত এ আঁ? আমার মনে হল, এই কন্ঠস্বরটির জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত আছি।